নববি কাফেলা

নেতৃত্ব, দক্ষতা, কুরবানি

মাহমুদ শীত খাত্তাব

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

প্রখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক, সমরবিদ
মাহমুদ শীত খাত্তাব রহিমাহুল্লাহর

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব জন্মেছিলেন ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে; চারদিকে তখন উত্থান-পতনের ফেনিল জোয়ার—বাঁধভাঙার গগনবিদারি আওয়াজ। তাই দুনিয়া-কাঁপানো অনেক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছেন তিনি। ১৯১৯ সালে উত্তর ইরাকের মসুল শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনই আরব। পিতার দিক দিয়ে তিনি সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﷺ-এর বংশধর। তাঁর মা মুসেলের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুস্তফা বিন খালিলের মেয়ে।

তার জন্মের কয়েক মাস পর তার দ্বিতীয় আরেকটি ভাইয়ের জন্ম হয়। ফলে এক বছরের মাথায় তিনি মায়ের কোল হারান—প্রতিপালিত হন তার দাদির কোলে। দাদি ছিলেন একজন দ্বীনদার পরহেজগার তাহাজ্জুদগুজার পুণ্যবতী নারী। তার মুবারক হাতেই তিনি তরবিয়ত লাভ করেন।

শৈশবেই তিনি কুরআন হিফজ করেন। তারপর মুসেলেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। মুসেলের মসজিদে শাইখদের দরসগুলোতে তিনি নিয়মিত বসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি আরবি ভাষা ও শরিয়াহর ইলম অর্জন করেন।

যুবক মাহমুদ চেয়েছিলেন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন। কিন্তু নিয়তি এসে তার নিয়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভর্তি হতে হয় সামরিক কলেজে। ঘুরে যায় তার পড়াশোনার মোড়। এভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি হয়ে ওঠেন সামরিক বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল আর মুসলিম উম্মাহ লাভ করে একজন প্রতিভাবান সমরবিদ, ঐতিহাসিক ও সিরাত-গবেষক।

সমরশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ইলম অর্জনের পিপাসা

তাকে পৌঁছে দেয় এক অনন্য উচ্চতায়। সমরশাস্ত্রের মতো তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও ইসলামি শরিয়াহয়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি জামিয়া আজহারের ইসলামি গবেষণা বোর্ড, জর্দান ও দামেশকের আরবি ভাষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। আরব-বিশ্বের বিখ্যাত অনেক রেডিও ও টিভি চ্যানেলে তিনি সিরাত, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

তার সব পরিচয় ছাপিয়ে তার লেখক ও গবেষক পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে। তার লেখা ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, সিরাতুন্নবি ﷺ, সাহাবিদের জীবনী, ইসলামের বিজয়-যুগের ইতিহাস, ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের জীবনী, তাঁদের যুদ্ধকৌশল, ইসলামি সমরশাস্ত্র, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইসরাইলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

আর-রাসুলুল কায়িদ।

আস-সিদ্দিকুল কায়িদ।

আল-ফারুকুল কায়িদ।

কাদাতুন নাবিয়্যি ﷺ।

কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরাহ।

কাদাতু ফাতহি ফারিস।

কাদাতু ফাতহিশ শাম ওয়া মিসর।

আল-আসকারিয়াতুল ইসরাইলিয়্যাহ।

বাইনাল আকিদাতি ওয়াল কিয়াদাহ।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের রচনাবলি ইসলামি কুতুবখানার অনেক বড় একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের বড় বড় সেনাপতিদের যুদ্ধের ইতিহাস ও তাঁদের সমরকৌশল নিয়ে তার মতো বিশ্লেষণ ও গবেষণানির্ভর রচনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বললেই চলে।

বিভিন্ন ইসলামি সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করতেন। আরব-আজমের বড় বড় আলিমদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-সহ অনেক বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে তিনি জেলে গিয়ে দেখা করেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-কে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদবির করেন।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে। আল্লাহ তাআলা এই মহান মনীষীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। (আমিন)

সূচিপত্র

ভূমিকা ¦ ১৫

গাজওয়া ও সারিয়্যা ¦ ১৬

নেতা নির্বাচন ¦ ১৯

কমান্ডারগণের শেষ গন্তব্য ¦ ২৭

নবিজির কমান্ডারগণের শাহাদাত লাভ বা মৃত্যুতালিকা ¦ ২৯

কেন এ কিতাব রচনার প্রয়াস... ¦ ৪৯

নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণ

১. হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ ¦ ৫৮

২. উবাইদা বিন হারিস বিন মুত্তালিব ﷺ ¦ ৮৪

৩. আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আল-আসাদি ﷺ ¦ ৯৩

৪. উমাইর বিন আদি আল-খাতমি আল-আওসি ﷺ ¦ ১১২

৫. সালিম বিন উমাইর আল-আওসি ﷺ ¦ ১১৮

৬. মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আওসি আল-আনসারি ﷺ ¦ ১২৩

৭. জাইদ বিন হারিসা আল-কালবি ﷺ ¦ ১৬১

৮. আব্দুল্লাহ বিন উনাইস আল-জুহানি ﷺ ¦ ২০১

৯. আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আল-আওসি আল-আনসারি ﷺ ¦ ২০৮

১০. আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখজুমি ﷺ ¦ ২১৮

১১. মুনজির বিন আমর আস-সায়িদি
আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﷺ ¦ ২৩৮
১২. মারসাদ বিন আবু মারসাদ আল-গানাবি ﷺ ¦ ২৪৮
১৩. উক্কাশা বিন মিহসান আল-আসাদি ﷺ ¦ ২৫৮
১৪. আব্দুর রহমান বিন আওফ আজ-জুহরি ﷺ ¦ ২৭০
১৫. আব্দুল্লাহ বিন আতিক আল-আনসারি ﷺ ¦ ৩১৮
১৬. আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﷺ ¦ ৩২৭
১৭. কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি ﷺ ¦ ৩৫৬
১৮. আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি আল-কিনানি ﷺ ¦ ৩৬১
১৯. বাশির বিন সাদ আল-খাজরাজি আল-আনসারি ﷺ ¦ ৩৮৭
২০. গালিব বিন আব্দুল্লাহ আল-লাইসি ﷺ ¦ ৪০৪
২১. ইবনে আবুল আওজা আস-সুলামি ﷺ ¦ ৪১৮
২২. শুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদি ﷺ ¦ ৪২৩
২৩. কাব বিন উমাইর আল-গিফারি ﷺ ¦ ৪৩৫
২৪. জাফর বিন আবু তালিব ﷺ ¦ ৪৩৯
২৫. আবু কাতাদা বিন রিবয়ি আল-আনসারি ﷺ ¦ ৪৬৭
২৬. সাদ বিন জাইদ আল-আওসি ﷺ ¦ ৫০৩
২৭. তুফাইল বিন আমর আদ-দাওসি ﷺ ¦ ৫১৩
২৮. উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি ﷺ ¦ ৫২৩
২৯. কুতবাহ বিন আমির আল-খাজরাজি ﷺ ¦ ৫৫৮
৩০. দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি ﷺ ¦ ৫৬৮
৩১. আলকামা বিন মুজাজজিজ আল-মুদলিজি ﷺ ¦ ৫৭৮

নববি বাহিনী ¦ ৫৯২
১. সিরাহ সারসংক্ষেপ ¦ ৫৯২
২. নববি বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ¦ ৫৯৪
৩. সামরিক মসজিদের বার্তা ¦ ৫৯৬
৪. পরিপূর্ণ মুসলিমরূপে গঠন ¦ ৬০৫
৫. বাহিনী গঠনের ধাপসমূহ ¦ ৬০৫
৬. মহান বিজয়ের নেতা ¦ ৬০৯

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ
কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর
সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়
আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন।
তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।'

[সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৯]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

'তোমাদের যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে
আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ
করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসুলের মধ্যে
রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

[সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ২১]

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে আরব ও মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা নবিদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের ওপর।

কিতাব রচনার ক্ষেত্রে 'নববি কাফেলা' নামক কিতাবখানা থেকে আমি যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছি এবং উপভোগ করেছি, তা অন্য কোনো কিতাবের বেলায় হয়নি। এর রচনা ছিল আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপকারের একটি সম্মিলিত সুন্দর ও মনোরম সফর।

রচনা শেষে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিতাবটি পুনরায় পাঠ করলাম। এ পাঠ কোনো অর্থ ও মর্মের প্রতি পুনঃদৃষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। ফলে মূল কিতাবে কোনো শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিনি। নতুন কোনো চিন্তা বা মতামতও সংযোজন করিনি। শুধু এতটুকু করেছি, ভুলে কোনো শব্দের ফোঁটা বাদ গেলে ফোঁটা দিয়ে দিয়েছি এবং অনিচ্ছায় কোনো ভুল শব্দ লেখা হয়ে থাকলে তা সংশোধন করেছি। কিন্তু পুনরায় কিতাবটি পড়তে গিয়ে সময় একটু দীর্ঘায়ত হয়ে গেল। পাঠ উপভোগ করতে গিয়ে এবং ধারাবাহিক বিজড়িত প্রচুর চিত্রের মাঝে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে একটু বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য চার সপ্তাহ লেগে গেল। আর মানুষের জন্য সময়টা অনেক মূল্যবান বটে। দুনিয়াতে আমার সবচেয়ে দামি সম্পদ ও সবচেয়ে লোভনীয় বস্তু হলো এই সময়। বস্তুত বৈধ কোনো বিষয়ে বা উপকারী কোনো কাজে সময়ের ব্যবহার কখনো বৃথা যায় না।

এ কিতাব রচনা ও তা পুনরায় পাঠ করে যে স্বাদ উপভোগ করেছি এবং যত উপকার আমার অর্জন হয়েছে, তার গোপন ভেদ প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে না। বরং এ ভেদ উন্মোচন করা পাঠকের জিম্মায় রাখাই উত্তম মনে

হচ্ছে। যাতে রহস্য উদ্ধারের মিষ্টতা থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়। অবশ্য এটা হতে পারে, আমি যে স্বাদ পেয়েছি এবং আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে উপকার লাভ করেছি, সে স্বাদ ও অর্জন হয়তো অন্যরা নাও পেতে পারে।

এই কিতাব রচনা ও পুনরায় পাঠকালে আমি আল্লাহর কাছে আশা করেছি, যেন মুসলিমদের নেতারা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি বসাতে রাসুল ﷺ-কে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। শুধু সামরিক বিভাগেই নয়; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল সেক্টরে যেন তারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যাতে জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা নেতৃত্ব দেয় এবং সামরিক ও বিভিন্ন সেক্টরে জাতিকে বিজয় ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

এ কিতাবে সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটি আমি পেয়েছি, তা হলো বিভিন্ন অঙ্গনে যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে বসানোর ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর অভিনব পদ্ধতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত নীতি। বিশেষত সামরিক সেক্টরে কমান্ডার নিয়োগের ক্ষেত্রে, যা পাঠক এই কিতাব পড়ামাত্রই বুঝতে পারবে। পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরেও বিভিন্ন কমান্ডার নিযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সুবাসিত সিরাতে উত্তম আদর্শ খুঁজে পাবে।

সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর যেমন বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি ছিল—যা এই কিতাবে একেবারেই সুস্পষ্ট—তেমনই অন্যান্য বেসামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অনেক নীতি ও পদ্ধতি। যার মাধ্যমে তিনি সেরা নেতৃত্বের এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে মহান রব্বে কারিমের ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় বেসামরিক ও সামরিক অঙ্গনে বিরাট সংখ্যক নেতৃত্ব তিনি রেখে গিয়েছিলেন। যাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল স্ব স্ব সেক্টরে বিরাট ও স্থায়ী অবদান।

গাজওয়া ও সারিয়্যা

২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং রাসুল ﷺ-ই ছিলেন যুদ্ধের জেনারেল। তন্মধ্যে মাত্র নয়টি ময়দানে ইসলাম ও কুফরের মাঝে যুদ্ধ বেধেছিল। আর বাকি ১৯টি ময়দানে যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল রাসুল ﷺ-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

হিজরতের পর থেকে গাজওয়াসমূহে রাসুল ﷺ-এর জিহাদ সর্বমোট সাত বছর চলমান ছিল। দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে তিনি ওয়াদ্দান যুদ্ধে বের হন। এটাই ছিল প্রথম গাজওয়া, যেখানে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেন। আর নবম হিজরির রজব মাসে বের হন তাবুকের যুদ্ধে। এটিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ।

কিন্তু রাসুল ﷺ-এর জিহাদ শুধু গাজওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর জিহাদ গাজওয়ার সাথে সারিয়্যা অভিযানেও বিস্তৃত ছিল। গাজওয়া এবং সারিয়্যা অভিযানের মধ্যে পার্থক্য আছে। সরাসরি রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধকে বলে গাজওয়া আর তাঁর নির্দেশে কোনো সাহাবির নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধকে বলে সারিয়্যা।

রাসুল ﷺ-এর সারিয়্যার সংখ্যা ছিল ৪৭টি। আরেক বর্ণনামতে তার চেয়েও বেশি। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ প্রথম মতের ওপর একমত পোষণ করেছে।

এই অভিযানগুলো নয় বছর চলমান ছিল। শুরু হয়েছিল প্রথম হিজরির রমাদান মাসে হামজা ﷺ-এর নেতৃত্বে ঈস অভিমুখে প্রেরণের মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছিল দশম হিজরিতে মাজহাজ অঞ্চলে আলি ﷺ-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে।

এই সাত বছরের গাজওয়া ও নয় বছরের সারিয়্যার বড় ফলাফল ছিল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাজিরাতুল আরব এই আরবেরই সন্তান মুসলিমদের নেতৃত্বের অধীনে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়। আরবের ভূমিকে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত করা হয় এবং সমস্ত অঞ্চল থেকে মূর্তি ও প্রতিমাগুলোকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ফলে তাওহিদ ও ঐক্যের দ্বীন ইসলামের বদৌলতে পুরো আরব কোনো শরিকবিহীন এক ইলাহের ইবাদতকারী হয়ে যায়।

অভিযানসমূহে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৩৭ জন সাহাবি। যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন মোট ৪৭টি অভিযানে। কেউ একটিতে, আবার কেউ বিভিন্ন সময়ে একাধিক সারিয়্যা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তালিকায় আমরা ৩৮ জন কমান্ডারের নাম পাব। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আনসারি ﷺ-এর নামও যুক্ত করা হয়েছে। যিনি উহুদ যুদ্ধে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পেশ করেছিলেন জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানি। পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল ছিলেন নিজ অবস্থানে। বীরত্ব, সাহসিকতা, আনুগত্য, অবিচলতা এবং ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তম আদর্শ। তাই তাঁর বরকতময় জীবনী নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণের জীবনীর সাথে যুক্ত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাঁর নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং তাঁর বিরল বীরত্বকে মূল্যায়ন করে এখানে তা যুক্ত করলাম। যাতে প্রতিটি মুসলিম সৈনিক ও কমান্ডারের সামনে উত্তম আদর্শ হিসেবে থাকতে পারে। তার ওপর আবার স্বয়ং রাসুল ﷺ-ই তাঁকে তিরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচন করেছিলেন। যারা উহুদে মুজাহিদ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। কারণ তাঁরাই সেদিন মুসলিম বাহিনীকে পেছনের দিক থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর তাঁদের অবস্থানক্ষেত্রটিই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ যদিও রাসুল ﷺ-এর অভিযানসমূহ থেকে অন্য কোনো অভিযানে নেতৃত্ব দেননি। শুধু উহুদের যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কষ্টসাধ্য অংশের কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু উহুদে তিরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দানের ব্যাপারটি অন্য কোনো অভিযানে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার যোগ্যতা, সম্মান ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ অন্য কোনো কমান্ডারের চেয়ে কোনো অংশে কম নন।

গাজওয়া ও সারিয়্যাগুলোতে জিহাদের ফলাফলগুলো ছিল বাস্তবিকই পরিপক্ব। আর এমন ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বের ছিল চূড়ান্ত এবং যুগান্তকারী প্রভাব। সে প্রভাব ছিল গাজওয়া জিহাদে প্রত্যক্ষভাবে—রাসুল হয়ে কমান্ডিং করার কারণে এবং সারিয়্যা জিহাদে ছিল পরোক্ষভাবে—সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিকে কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে। অর্থাৎ যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়ার কারণে।

সারিয়্যাগুলোর নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর এই যে অনন্য নীতি ও পদ্ধতি, উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন জিম্মাদার নির্বাচনের এই যে অসামান্য

আকাঙ্ক্ষা; যাতে তা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর হয়—তার মাঝে অবশ্যই এমন উপদেশ ও শিক্ষা আছে, যা থেকে বর্তমানের নেতা ও অনুগত সবারই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যদি যুদ্ধে জয়ী হতে চাই এবং উন্নতি সাধন করতে চাই। কারণ সকল মুসলিমের জন্যই আজ বিজয় ও উন্নতি দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালের বিজয়ী ও উন্নত জাতি আজ পরিণত হয়েছে পরাজিত ও অনুন্নত জাতিতে। এটা তখন থেকে হয়েছে, যখন থেকে তারা মুসলিমদের গড়ে তোলা ভিত থেকে সরে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে মানব ধ্বংসের পেছনে। এবং উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে। ফলে আমাদের কপালে ধ্বংস আর বরবাদিই নেমে এসেছে।

নেতা নির্বাচন

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি বসানো সহজ কোনো কাজ নয়। এটা বাস্তব জীবনে নেতা ও অনুগত সবারই সফলতার রহস্য। যুদ্ধ ও শান্তিকালীন উভয় সময়েই।

অবশ্য এটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। কারণ আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া, সর্বদাই মন্দের নির্দেশদাতা মানবাত্মা নিজ থেকে জ্ঞান ও যোগ্যতায় উত্তম ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ দুষ্ট আত্মা তার আশপাশ থেকে চাকচিক্যতা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় পায় এবং এর ফলে সে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকে।

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান নেতা ও অনুগতদের সফলতার রহস্য। বরং এতে তাদের সফলতার অঙ্গনে রয়েছে আরও অনেক উন্নতির রহস্য। কারণ সৎ ও যোগ্য নেতাগণ তাদের জনগণকে যুদ্ধের সময় বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং শান্তিকালীন সময়ে উন্নতি ও সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। এই সাহায্যের ছিল নিশ্চিত প্রভাব তাঁর সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হওয়ার ক্ষেত্রে, ফায়সালা ও বিধান দানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও পরিচালকের আসনে,

কমান্ডার ও সৈনিক হওয়ার ক্ষেত্রে, মুরব্বি ও শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিপূর্ণ মানব হওয়ার ক্ষেত্রে, এমন মানব—যার কাছে ওহি পাঠানো হয়।

এসব যোগ্যতাই হচ্ছে উত্তম আদর্শ। যে আদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একজন বিবেকসম্পন্ন মুমিন অবশ্যই তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ এগুলো এমন যোগ্যতা, যা অর্জন করার জন্য যেকোনো অনুসরণীয় ব্যক্তিই সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাবে।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন :

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

'আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি তাঁর রিসালাতকে কোথায় অর্পণ করবেন।'[১]

তবে ওহি দ্বারা সাহায্য একমাত্র নবি-রাসুলদের মাঝে সীমাবদ্ধ।

রাসুল ﷺ-এর সিরাত এবং তাঁর কমান্ডারগণের জীবনী অধ্যয়ন করে যে জিনিসটা আমি পেয়েছি, তা হলো, রাসুল ﷺ-এর সকল যোগ্যতার মধ্যে একটি বিরল যোগ্যতা ছিল উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার প্রতিভা।

তিনি এ যোগ্যতাকে তাঁর বরকতময় জীবনে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এটাকেই তিনি যুদ্ধের দিনে বিজয় অর্জন এবং শান্তির সময়ে আরও অধিক সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়াবি মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের জানতেন সবিস্তারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। প্রত্যেক সাহাবিকে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য সহকারে চিনতেন, যে বৈশিষ্ট্য নতুন ইসলামি সমাজের উপকারে আসবে। ফলে সেসব বৈশিষ্ট্যকে তিনি এই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণে এবং সকল মুসলিমের কল্যাণে ব্যবহার করতেন।

১. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২৪।

একই সময়ে তিনি সকল সাহাবির স্বভাবজাত ত্রুটি সম্পর্কেও খবর রাখতেন। সেসব ত্রুটির থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতেন, সেগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা করতেন এবং সেগুলোর অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখতেন। তিনি সকল সাহাবিকে তাঁদের উত্তম বৈশিষ্ট্যের সাথে স্মরণ করতেন এবং সেটার ব্যাপারে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি সাহাবিদেরকে তাঁদের মুসলিম ভাইদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে গিয়ে তাদের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে মূল্যায়ন করার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন।

রাসুল ﷺ তাঁর এই চমৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলির দ্বারা সাহাবিদের গড়ে তুলতেন। আর তাঁদের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তা উত্তম পন্থায় সংশোধন করতেন।

এই বিস্ময়কর পদ্ধতির মাধ্যমেই রাসুল ﷺ একজন মুসলিমকে গড়ে তুলতেন, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেন। বক্রতাকে সোজা করতেন, সোজা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলতেন না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়টাকে একসাথে মজবুত করতেন। শুধু বর্তমান বা একটি সময়ের জন্য সংহত করতেন না।

সাহাবিদের মাঝে থাকা বৈশিষ্ট্যাবলি বেকার রেখে দিতেন না। বরং নতুন সমাজের কল্যাণে তা ব্যবহার করতেন। এর মাধ্যমে তাঁদের সেসব বৈশিষ্ট্য পরস্পর একীভূত হয়ে উম্মাহর ভিতকে শক্তিশালী করত এবং উম্মাহকে বিজয় ও নির্মাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। তাঁদের কারও কোনো যোগ্যতাকেই তিনি ছোট মনে করতেন না এবং উপেক্ষা করতেন না কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির যোগ্যতাকে। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সাথে আরও যোগ্যতা এসে যোগ হতো। এরপর তাঁর মাঝে সে যোগ্যতাগুলো চমকাতে থাকত।

তিনি প্রত্যেক উত্তম যোগ্যতার অধিকারীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে নির্বাচন করতেন।

যে দুই শর্তকে সামনে রেখে রাসুল ﷺ নেতৃত্ব প্রদান করতেন, সে দুই শর্ত হলো ইসলাম এবং যোগ্যতা। আর মজবুত আকিদা ছিল নেতৃত্ব পাওয়ার মৌলিক শর্ত; যাতে নেতা তার কাজের মূল ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তার কর্মের ফল যেন থাকে সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত; যেন তা পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছায়। কারণ এ ধরনের বিশ্বাসী কমান্ডার তার যোগ্যতা আর আকিদার ভিত্তিতে সঠিক পথে ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে কাজ করতে পারে। নিজের এবং পরিবারের তুলনায় সে তার আকিদা ও সমাজের জন্য বেশি কাজ করে। আর এটাই হচ্ছে আকিদা-বিশ্বাসহীন কমান্ডারের ওপর অথবা যে কমান্ডারের খারাপ আকিদা থাকে—ফলে সে তার খারাপ বিশ্বাসের কারণে সমাজ বা জনকল্যাণের জন্য কাজ না করে নিজের জন্য কাজ করে—তাদের ওপর বিশ্বাসী কমান্ডারদের শ্রেষ্ঠত্বের গোপন রহস্য।

তা ছাড়া উচ্চতর যোগ্যতাও ছিল নেতৃত্ব পাওয়ার একটি মৌলিক শর্ত। যাতে কমান্ডার তার দায়িত্ব আদায়ে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং তার কর্ম সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে থেকে পরিপূর্ণতার কাছাকাছি থাকে। কারণ যোগ্যতাসম্পন্ন কমান্ডার যোগ্যতার বলে এর নির্ভরতা নিয়ে কাজ করে। অস্থির ও এলোপাতাড়ি কাজ করে না। যোগ্যতা তাকে ভুল থেকে বাঁচিয়ে সঠিকতার দিকে পরিচালিত করে। তাড়াহুড়া থেকে দূরে রেখে সুচিন্তিত কাজের নিকটবর্তী করে।

রাসুল ﷺ-এর ৩০ জন কমান্ডার সূচনালগ্নেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাঁদের ২১ জন বদরি সাহাবি। যাঁরা রাসুল ﷺ-এর নেতৃত্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা ছিলেন খাঁটি এবং গভীর ইমানের অধিকারী। তাঁদের আকিদায় ইখলাস ও একনিষ্ঠতা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাঁরা দৃঢ়ভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ কারণে রাসুল ﷺ তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতেন। নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর তাঁদেরই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাঁদের মাঝে শুধু কুরজ বিন জাবির আল-ফিহরি ﷺ হিজরতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে একটি সারিয়্যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুঃসাহসী অশ্বারোহী ও নির্ভীক বীর। নিপুণভাবে আক্রমণ ও পশ্চাদ্ধাবন করতে পারতেন। তিনি যে অভিযানের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন,

তা অশ্বারোহীদের দ্বারা গঠিত ছিল। যাদের কাজ ছিল দ্রুত লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করা। আর এ কাজের জন্য কুরজ বিন জাবির ﷺ ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি।

তাঁর কমান্ডারগণের মধ্যে একজন উহুদ যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল হিজরি তৃতীয় সনে। তিনি হলেন আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরি ﷺ। অনন্য বীরত্ব এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে কমান্ডার বানিয়েছিলেন। তিনি উত্তমভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

পাঁচজন কমান্ডার মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, ইবনে আবুল আওজা আস-সুলাইমি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল-মাখজুমি, আমর ইবনুল আস আস-সাহমি, উয়াইনা বিন হিসন আল-ফাজারি ও আলকামা বিন মুজাজ্জিজ আল-মুদলিজি ﷺ।

ইবনে আবুল আওজা ﷺ নিজ কওমের প্রতি একটি দাওয়াতি অভিযানের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর কওমের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় তিনিই বেশি জানতেন। তাদের ভেতরে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথগুলোর ব্যাপারে জানতেন। কওমের লোকেরাও তাকে ভালো করে জানত। অন্যের তুলনায় তাঁর দাওয়াতেই তারা বেশি সাড়া দেবে। ইসলাম কবুলের জন্য প্রভাব ফেলতে তিনিই বেশি যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি; বরং কুফরের ওপরই অটল থাকে।

রাসুল ﷺ উয়াইনা বিন হিসন ﷺ-কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি গাতাফান গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর কথা শুনত এবং মানত। সবাই তাঁকে সমীহ করত। রাসুল ﷺ একবার তামিম গোত্রের একটি শাখা গোত্রের কাছে জাকাত উসুলের জন্য এক সাহাবিকে প্রেরণ করলেন; কিন্তু তারা তাঁর কাছে জাকাত দিতে অস্বীকার করল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'এরা যে কাজটা করল, তার সমাধান করার মতো কে আছে?' সর্বপ্রথম উয়াইনা ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে ৫০ জন বেদুইন ঘোড়সওয়ার দিয়ে প্রেরণ করলেন। তাঁদের মাঝে কোনো মুহাজির বা আনসারি সাহাবি ছিলেন

না। সম্ভবত উয়াইনা ﷺ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সবার আগে প্রস্তুত হওয়ার কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে এমন দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে কোনো আনসার বা মুহাজির সাহাবি ছিলেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম, যাঁদের ওপর তাঁদের মতোই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের থেকে নেতৃত্বের উচ্চতর যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করা সমীচীন নয়। তবে কোনো বিশেষ প্রয়োজনে ভিন্ন হতে পারে অথবা চূড়ান্ত কোনো প্রজ্ঞার কারণে, যা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট রবে না।

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, রাসুল ﷺ কখনোই প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের ছাড়া উয়াইনা ও তার মতো নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কাউকে তাঁর কোনো সারিয়্যার কমান্ডার নিযুক্ত করতেন না, যদি উয়াইনা অন্যদের পূর্বেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে না আসত। যদি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের থেকে কেউ তার পূর্বে এগিয়ে আসত, তাহলে তিনিই হতেন নেতৃত্ব গ্রহণের অধিক উপযুক্ত। সুতরাং শুধু ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা ও ইসলামকে একনিষ্ঠভাবে সাহায্য করা ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রগামী করে দিত এবং যুদ্ধের সেনাদের নেতৃত্ব দানের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করত।

রাসুল ﷺ-এর সারিয়্যাগুলোর কমান্ডারদের জীবনী অধ্যয়ন থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শুরু যুগের ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার। তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ছিলেন মুহাজির ও আনসার। ৬০ শতাংশ ছিলেন বদরি সাহাবি, আর বদরি সাহাবিগণ তো অন্যান্য সাহাবিদের থেকে মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

রাসুল ﷺ কোনো বেদুইন ও গ্রাম্য ব্যক্তিকে সভ্য ও শহুরে লোকের ওপর আমির বানাননি। ৩৭ জন কমান্ডারের মধ্যে ৩৫ জনই ছিলেন শহরের আর দুজন ছিলেন গ্রামের অধিবাসী। উয়াইনা বিন হিসন, যিনি নেতৃত্বের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং দাহহাক বিন সুফিয়ান কালানি ﷺ, যিনি ছিলেন একজন সেরা বীর, যাকে শত অশ্বারোহীর সমপর্যায়ের গণ্য করা হতো; তা ছাড়াও তিনি মদিনাতে নবিজি ﷺ-এর পাশে তরবারি ধারণকারী হিসেবে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেছেন। মোটকথা এ দুজনকে নেতৃত্ব দেওয়া

হয়েছিল বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে। শহরের লোককে রাসুল ﷺ নেতৃত্ব দিতেন, যেহেতু শহুরে ব্যক্তি গ্রাম্য লোকের চেয়ে যুদ্ধবিদ্যায় বেশি পারদর্শী। এবং যুদ্ধের কষ্ট-ক্লেশ সহ্যের ক্ষেত্রে তারা গ্রাম্য লোকের চেয়ে অধিক সক্ষম ও ধৈর্যধারণকারী।

সারকথা, নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য মৌলিক দুটি শর্ত : ইসলাম এবং যোগ্যতা। এই দুটো শর্ত কোনো ভিন্নতা ছাড়াই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্য শর্তসমূহ হচ্ছে, আগে ইসলাম গ্রহণকারী, বদরি সাহাবি, শহুরে ব্যক্তি হওয়া। তবে প্রয়োজনের খাতিরে এই শর্তগুলোর বিপরীতও হতে পারে।

রাসুল ﷺ এবং আবু বকর ও উমর رضي الله عنهما নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা উম্মাহর মধ্য থেকে আকিদা ও যোগ্যতায় সেরা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যাতে তাঁরা যুদ্ধে উম্মাহর বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারেন এবং শান্তিকালীন সময়ে উম্মাহকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

সেই জাতি কতই না ভাগ্যবান, যাদেরকে দ্বীন ও যোগ্যতায় সেরা ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দান করে!

রাসুল ﷺ ও তাঁর দুই খলিফা প্রতিটি মুসলিমের গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাতেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে সেগুলোকে ইট হিসেবে চয়ন করতেন। ফলে যে স্থানে যে ইট রাখা দরকার, সে স্থানে সে ইটই রাখতেন। যাতে এই প্রাসাদ নিরাপদে উঁচু হতে হতে মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কমান্ডারকে নিয়োগ করাই ছিল রাসুল ﷺ ও তাঁর খলিফাদ্বয়ের যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন সময়ে সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিজয় ও সফলতার অন্যতম কারণ।

রাসুল ﷺ ইনতিকালের সময় ইসলামি সমাজে অনেক কমান্ডার, আমির, আলিম, ফকিহ ও মুহাদ্দিস রেখে যান। যাঁরা উম্মাহকে ইসলামের সকল অঙ্গনে বিজয়, সফলতা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করেন। উম্মাহকে এগিয়ে নিয়ে যান সম্মান, মর্যাদা, সৌভাগ্য, হক ও হিদায়াতের পথে।

এই কমান্ডার ও নেতাগণ ছিলেন রাসুল ﷺ-এর মাদরাসা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

কমান্ডার নির্বাচনের এই জীবন্ত শিক্ষা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আরব ও সকল মুসলিমের গ্রহণ করা উচিত। কমান্ডার হোক বা সাধারণ লোক, শাসক হোক বা জনগণ—তাদের উচিত এসব যোগ্যতা থেকে উপকৃত হওয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দেওয়া।

তবে অবশ্য প্রত্যেক নেতাই যোগ্য ব্যক্তি তৈরি করতে পারে না এবং যোগ্যতাকে চয়ন করে ঠিক জায়গায় রাখতে পারে না।

রাসুল ﷺ ছিলেন উম্মাহর কল্যাণে নিজের স্বার্থকে ভুলে গিয়ে উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায়। এ কারণে তাঁর বিদ্যাপীঠ থেকে বের হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরের এবং বিভিন্ন অঙ্গনের সর্বকালের সর্বসেরা যোগ্য ব্যক্তিগণ।

এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। বিশেষত উম্মাহর স্বার্থে নিজের স্বার্থকে ভুলে যাওয়া। নিশ্চয় এটা ওই নেতাদের জন্য খুবই কঠিন কাজ, যারা অন্যের স্বার্থের জন্য নয়; বরং ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নেতৃত্বের পদে সমাসীন হয়।

রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন :

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ

'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায় থেকে এমন লোককে দায়িত্ব দিল; অথচ সে সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক আছে, যে তার চেয়েও আল্লাহকে অধিক সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করল।'[২]

এটি মানবজীবনের এমন এক সামগ্রিক বয়ান, রাসুল ﷺ সেটা কয়েক শব্দে বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ কয়েকটি শব্দ কয়েক খণ্ড কিতাবের কাজ করে দিয়েছে।

২. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১১২১৬। দেখুন, মুখতাসারুল জামিয়িস সগির : ২/২৮৭।

কমান্ডারগণের শেষ গন্তব্য

নবিজি ﷺ-এর কমান্ডারগণ শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বমূলক যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হলো, তাঁরা ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের সাথে যত যুদ্ধেই জড়িয়েছিলেন, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রতিটি যুদ্ধেই তাঁরা বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন; অথচ শত্রুরা ছিল শক্তি ও সংখ্যায় তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি।

অনন্য বীরত্ব একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা একজন যোগ্য নেতার জন্য আবশ্যকীয় গুণ। আর এই অনন্য বীরত্ব রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল।

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের অনন্য বীরত্বের অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, তাঁদের মাঝে ২২ জন কমান্ডার শাহাদাত লাভ করেছেন। আর ১৫ জন কমান্ডার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছেন শতকরা ৬০ জন আর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন শতকরা ৪০ জন।

অতীতে ও বর্তমানে সকল যুদ্ধের ইতিহাসে রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের শাহাদাতের পরিমাণের তুলনায় বেশি কমান্ডার নিহত হওয়ার ঘটনা আমার জানা নেই। কারণ স্বাভাবিকভাবেই সৈনিকের প্রাণহানির চেয়ে কমান্ডারের প্রাণহানি অনেক কম হয়। আর ভালো পরিস্থিতিতে তো কখনো কমান্ডারের প্রাণহানি শতকরা একজনেও পৌঁছে না।

রাসুল ﷺ-এর কমান্ডারগণের মাঝে এত পরিমাণে শাহাদাতের কারণ হিসেবে তাঁদের সর্বোচ্চ বীরত্বকে উপস্থাপন করলে তা সঠিক ও যুক্তিসংগত হবে ঠিক; কিন্তু এটাই পরিপূর্ণ বাস্তবতা নয়। পরিপূর্ণ বাস্তবতা হচ্ছে, এর কারণ ছিল তাঁদের সর্বোচ্চ বীরত্ব এবং গভীর ইমান। শাহাদাত অন্বেষণের ক্ষেত্রে গভীর ইমানের মতো অন্য কোনো শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র চালিকাশক্তি আর হতে পারে না—যে শাহাদাত সীমিত জীবন থেকে মুক্ত করে অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

শাহাদাতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন লাভের যে আদর্শ ও বিশ্বাস ইসলাম নিয়ে এসেছে, অন্য কোনো আসমানি ধর্মের যুদ্ধের শিক্ষাতেও তার কোনো উপমা নেই। পুরো দুনিয়ার যুদ্ধবিদ্যায় এটি অনন্য এক আদর্শ, এর মাধ্যমে ইসলামি সমরবিদ্যা হয়েছে অতুলনীয়। অন্য কোনো সমরবিদ্যা এখন পর্যন্ত তার সমকক্ষ আদর্শ ও বিশ্বাস দিতে পারেনি।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট তারা রিজিকপ্রাপ্ত।'[৩]

৩. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৯।

নবিজির কমান্ডারগণের শাহাদাত লাভ বা মৃত্যুতালিকা

ক্রমিক নং	কমান্ডার	ইসলাম গ্রহণ	সমাপ্তি	শাহাদাত বা মৃত্যুর স্থান	শাহাদাত বরণ বা মৃত্যুসন	
					হিজরি	খ্রিষ্টাব্দ
১	হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদ	৩	৬২৪
২	উবাইদা বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বদর-প্রান্তর	২	৬২৩
৩	আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদের ময়দান	৩	৬২৪
৪	উমাইর বিন আদি ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	উহুদের ময়দান	৩	৬২৪
৫	সালিম বিন উমাইর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকাল	
৬	মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৪৩	৬৬৩

৭	সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৫৫	৬৭৫
৮	জাইদ বিন হারিসা রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মুতা-প্রান্তর	৮	৬২৯
৯	আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	গাজা	৫৪	৬৭৩
১০	আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	উহুদ	৩	৬২৪
১১	আবু সালাম বিন আব্দুল আসাদ রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মদিনা	৪	৬২৫
১২	মুনজির বিন আমর রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বিরে মাউনা	৪	৬২৫
১৩	মারসাদ বিন আবু মারসাদ রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	রাজি	৪	৬২৫
১৪	উক্কাশা বিন মিহসান রা.	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	বুজাখানাহ	১১	৬৩২

১৫	আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	মহামারিতে মৃত্যু	আমওয়াস	১৮	৬৩৯
১৬	আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৩২	৬৫২
১৭	আলি বিন আবু তালিব ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	কুফা	৪০	৬৬০
১৮	আব্দুল্লাহ বিন আতিক ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
১৯	আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মুতা	৮	৯২৯
২০	কুরজ বিন জাবির ﵁	হিজরতের পর	শহিদ	মক্কা	৮	৬২৯
২১	আমর বিন উমাইয়া ﵁	উহুদের যুদ্ধের পর	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	মুআবিয়া ﵁-এর খিলাফতকালে।	
২২	উমর বিন খাত্তাব ﵁	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	মদিনা	২৩	৯৪৩

২৩	আবু বকর সিদ্দিক ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	১৩	৬৩৪
২৪	বাশির বিন সাদ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	আইনে তামর	১২	৬৩৩
২৫	গালিব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	–	–	–
২৬	ইবনে আবুল আওজা ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	শহিদ	বনু সুলাইমের এলাকা	৭	৬২৮
২৭	শুজা বিন ওয়াহ্যব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
২৮	কাব বিন উমাইর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	জাতে আতলাহ	৮	৬২৯
২৯	জাফর বিন আবু তালিব ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	মুতা	৮	৬২৯
৩০	আবু কাতাদা বিন রিবয়ি ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	৫৪	৬৭৩

৩১	খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	হিমস	২১	৬৪১
৩২	আমর ইবনুল আস ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	কায়রো	৪৩	৬৬৪
৩৩	সাদ বিন জাইদ ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	স্বাভাবিক মৃত্যু	–	–	–
৩৪	তুফাইল বিন আমর ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	ইয়ামামা	১১	৬৩২
৩৫	উয়াইনা বিন হিসন ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে।	
৩৬	কুতবাহ বিন আমির ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরি	স্বাভাবিক মৃত্যু	মদিনা	উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে।	
৩৭	দাহহাক বিন সুফিয়ান ﷺ	সূচনাযুগে ইসলাম গ্রহণকারী	শহিদ	বনু সুলাইমের এলাকা	১১	৬৩২
৩৮	আলকামা বিন মুজাজ্জিজ ﷺ	মক্কা-বিজয়ের পূর্বে	শহিদ	হাবশা	২০	৬৪০